International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 79-86
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.198

প্রবন্ধের শিরোনাম: *প্রত্নতত্ত্বের আলোকে শুশুনিয়া পাহাড়: একটি পর্যালোচনা*

তানিয়া পাল

রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 10.02.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Susunia hill has a significant role in history from prehistory to modern times. Susunia is situated at the Northwestern part of Bankura district of West Bengal. Susunia has attracted the attention of scholars, antiquarians and pilgrims for its rich archaeological, epigraphical heritage, natural beauty and sacred springs. This article revisits the archaeological and epigraphic evidence from Susunia hill to reconstruct its role in prehistoric, protohistoric, and early historic Bengal. This paper undertakes a multidisciplinary exploration method of the site to focus on its archaeological findings and the renowned inscription of king Chandravarman. Through a detailed analysis of palaeolithic tools, fossils, early historic evidence and the inscription of Chandravarman (4th c. CE) it conveyed that Susunia is an important cultural and political centre which is still in use by the local people. New interdisciplinary approaches are proposed to address gaps in current research.

Keywords: Susunia, Prehistoric, Fossil, Inscription, Chandravarman, Pushkarna

ভূমিকা:

শুশুনিয়া পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড় উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত। ভৌগোলিকভাবে শুশুনিয়া পাহাড় প্রায় ২৩.৩° উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯.৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৪৪০ মিটার (প্রায় ১৪৪২ ফুট) উচ্চতায় বিস্তৃত। শুশুনিয়া পাহাড় ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল একটি সমৃদ্ধ প্রাগৈতিহাসিক সম্পদের ভাণ্ডার, যা দীর্ঘকাল ধরে গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক, জীবাশ্মগত, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা। এই সুদীর্ঘকালব্যাপী বিকাশপ্রক্রিয়া শুশুনিয়াকে বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডে পরিণত করেছে। এখান থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্মযুক্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিদর্শন, প্রাগৈতিহাসিক পাথরের হাতিয়ার, প্রাথমিক ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রত্নবস্তু, খণ্ডিত শিলালিপি এবং ভাস্কর্য এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী মানব বসতি ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের উপস্থিতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এই সব উপাদান একত্রে শুশুনিয়া পাহাড়কে কেবল একটি প্রাকৃতিক ভূখণ্ড নয়, বরং একটি সক্রিয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই গবেষণাপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হল নতুন অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে শুশুনিয়ার ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করা। সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং শিলালিপিগত প্রমাণের আলোকে শুশুনিয়া পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে পুনর্গঠন ও পুনর্মূল্যায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কাজ:

১৮৬৫ সালে ভূতাত্ত্বিক ভ্যালেন্টাইন বল প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করেন, যা পরবর্তীতে প্রকাশিত তাঁর প্রতিবেদনে নথিভুক্ত হয় (বল, ১৮৬৭)। এই হাতিয়ারগুলি প্রধানত নিস (gneiss) ও কোয়ার্টজাইট পাথরে নির্মিত ছিল এবং এ অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানব ক্রিয়াকলাপের প্রাচীনত্বের প্রতি প্রথম গবেষণামূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর ১৯৫৯–১৯৬০ সালে ভি. কৃষ্ণস্বামীর নেতৃত্বে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (ASI) বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার কংসাবতী নদী উপত্যকায় একটি বিস্তৃত অনুসন্ধান পরিচালনা করে। এই অনুসন্ধানের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়, যা অঞ্চলটির দীর্ঘকালব্যাপী মানব বসতির সাক্ষ্য প্রদান করে (কৃষ্ণস্বামী, ১৯৬০)। একই ধারাবাহিকতায়, ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতাত্ত্বিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে ধরণী সেন বাঁকুড়া জেলার দারকেশ্বর নদী উপত্যকায় গবেষণা পরিচালনা করেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার ও সরঞ্জামের সন্ধান পান (সেন, ১৯৬৩)।

শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। তিনি ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রথমবারের মতো শুশুনিয়া পাহাড় ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, যার ফলস্বরূপ কোয়ার্টজ (quartz) দ্বারা নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক কুঠার (handaxe) আবিষ্কৃত হয় (দাশগুপ্ত, ১৯৬৭)। পরবর্তীকালে তাঁর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ধারাবাহিক অনুসন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার পাথরের হাতিয়ার ও জীবাশ্মগত নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা শুশুনিয়ার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে স্পষ্ট করে। পরবর্তীকালে এ. কে. দত্ত শুশুনিয়া অঞ্চলের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে এর একটি বিশদ ভূতাত্ত্বিক বিবরণ প্রদান করেন (দত্ত, ১৯৭৬), যা প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ১৯৮৫–৮৬ সালে বাঁকুড়া জেলার গন্ধেশ্বরী নদীর তীরবর্তী শুশুনিয়া অঞ্চলে একটি সংগঠিত অনুসন্ধান কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে বামুণ্ডিহা, বিরিবাড়ি ও সুয়াবাসা এলাকায় স্তরবিন্যাসগত পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য কয়েকটি পরীক্ষামূলক খনন কার্য পরিচালিত হয়। আর. কে. চট্টোপাধ্যায় সমগ্র বাঁকুড়া জেলার একটি বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা করেন এবং শুশুনিয়া অঞ্চলকেও সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে, পাহাড় ও এর ঢালের অতিমাত্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত প্রকৃতির কারণে শুশুনিয়ার স্তরবিন্যাসগত অবস্থা বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০)। সাম্প্রতিককালে অভিক বিশ্বাস, অধ্যাপক এস. এন. রাজগুরু এবং তাঁদের সহযোগী দল শুশুনিয়া ও সংলগ্ন এলাকার ভূ-প্রত্নতাত্ত্বিক দিকগুলি পুনরায় পরীক্ষা করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে নতুন তথ্য উপস্থাপন করেন (বিশ্বাস, ২০১৪)। এছাড়া, আনেক আর. সাংখ্যন ও তাঁর সহকর্মীরা শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথরের হাতিয়ার ও স্তন্যপায়ী জীবাশ্মের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। স্তরবিন্যাসগত অবস্থানের ভিত্তিতে তাঁরা শুশুনিয়ার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে আনুমানিক দুই লক্ষ বছর পূর্ববর্তী বলে প্রস্তাব করেন (সাংখ্যন, ২০০৯) ।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণায় লেখক পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রকাশিত রচনাবলীর সমালোচনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে শুশুনিয়া পাহাড় ও তার আশেপাশের অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং শিলালিপিগত গুরুত্ব পুনর্বিবেচনার চেষ্টা করেছেন, যাতে এই অঞ্চলের দীর্ঘ মানব ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

পদ্ধতি:

এই গবেষণায় শুশুনিয়া পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের ইতিহাস পুনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি মিশ্র গবেষণা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে গুণগত বিশ্লেষণ ও আন্তর্বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যমে অঞ্চলটির দীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক বিকাশকে অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ (Archaeological Survey of India) কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও উৎখনন প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে। এসব নথির ভিত্তিতে লেখক শুশুনিয়ার প্রাগৈতিহাসিক পর্যায় থেকে প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়ন ও কাঠামোবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও শিলালিপিগত প্রমাণের সমন্বিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই গবেষণা বিভিন্ন কালপর্বে শুশুনিয়া অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ক্রমপর্যায় ও পরিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরেছে। এর ফলে শুশুনিয়ার ভূমিকা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষাপটে নয়, বরং ধারাবাহিক ও বহুস্তরীয় ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন:

প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার ও জীবাশ্মগত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে শুশুনিয়া পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চল বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই এলাকায় প্রাপ্ত বিস্তৃত পাথরের সরঞ্জামসমূহ প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাথমিক ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানব কার্যকলাপের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের পণ্ডিত ও গবেষকেরা বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলটি একাধিকবার অনুসন্ধান ও খনন কার্য পরিচালনা করেছেন। এর ফলস্বরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাথমিক ঐতিহাসিক সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরের পাথরের হাতিয়ার ও অন্যান্য প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। শুশুনিয়ার প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক স্তর প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুসন্ধানকালে এই অঞ্চলে হাতের কুঠার (handaxes), ক্লিভার (cleaver), চপার (chopper), ডিম্বাকৃতি হাতিয়ারসহ (oval tools) বিভিন্ন ধরনের প্রাগৈতিহাসিক পাথরের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। পাহাড়ঘাটা, জলজালিয়া, ভরতপুর, ধানকোড়া, বাবলাডাঙ্গা, বিরিবাড়ি, রামনাথপুর, বাঁকজোর, কুশবোরা, শিউলিবোনা, মেটেলা ও হাপানিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে মধ্য প্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ক্লিভার, সূচালো ও ধারালো চাছনি, ক্ষুদ্র আকারের হাতের কুঠার (প্রায় ৬.৫ সেমি), ছুরি (প্রায় ৬.২ সেমি) এবং বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাথরের অস্ত্র, যেমন ব্লেড ও বিউরিন (blade and burin)। অধ্যাপক এস. এন. রাজগুরু ও অভীক বিশ্বাসের গবেষণায় কোলুভিয়াল পলিতে সঞ্চিত নুড়ি-পাথরের স্তরের মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাথরের অস্ত্রের সঙ্গে অজ্ঞাত প্রাণীর জীবাশ্মের উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। এই নুড়ি-পাথরের স্তরটি শেষ প্লাইস্টোসিন যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। এর ফলে শুশুনিয়া অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক মানব কার্যকলাপের কালানুক্রমিক গভীরতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনগুলির মধ্যেও উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে ছিদ্রযুক্ত রিং পাথর (ring stone), সেল্ট (celt), মুলার, ক্ষুদ্র হাতের কুঠার (প্রায় ৩.৮ সেমি) এবং উভয় প্রান্তে কার্যকর ধারযুক্ত ত্রিভুজাকার হাতের কুঠার (প্রায় ২১ সেমি) উল্লেখযোগ্য। ধানকোড়া ও বাঁকজোর এলাকায় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নব্য প্রস্তর যুগের আবিষ্কার ঘটেছে। স্থানীয় কোয়ার্টজাইট ও চার্ট পাথরের প্রাচুর্য ইঙ্গিত দেয় যে এগুলিই সরঞ্জাম নির্মাণের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ভৌগোলিক দিক থেকে শুশুনিয়ার পাহাড়ি অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জন্য প্রাকৃতিক গুহা ও শিলা-আশ্রয়স্থল (রক শেল্টার) হিসেবে উপযোগী ছিল। পাহাড়ের উভয় পাশে প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ বিদ্যমান ছিল এবং ধানকোড়া, বাঁকজোর ও গন্ধেশ্বরীর মতো নদীগুলি এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে

প্রবাহিত হয়ে স্থায়ী জলসরবরাহ নিশ্চিত করত। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক প্রমাণ একত্রে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিবেশজ্ঞান, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং স্থানীয় জলধারার সঙ্গে অভিযোজনমূলক সম্পর্কের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।

শুশুনিয়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের খোদাই ও তামার অস্তিত্ব তাম্রপ্রস্তর (chalcolithic) যুগের কার্যকলাপের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। এর সঙ্গে উদ্ধার হওয়া লোহার স্ল্যাগ ও লৌহ নির্মিত সরঞ্জাম ইঙ্গিত করে যে শুশুনিয়ায় লৌহ যুগের (খ্রিস্টপূর্ব ১০০০–৫০০ অব্দ) প্রযুক্তিগত কার্যকলাপ সক্রিয় ছিল। পাহাড়টির কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। প্রাথমিক ঐতিহাসিক সময়কালে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত, শুশুনিয়া একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে পখন্নায় (প্রাচীন পুষ্কর্ণ) মৌর্য ও মৌর্য-পরবর্তী যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত ইটনির্মিত কাঠামো, পোড়ামাটির মূর্তি এবং বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্পের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত এসব নিদর্শন প্রমাণ করে যে শুশুনিয়া প্রাচীন বাংলার নগরায়ন প্রক্রিয়ার একটি বৃহত্তর যোগাযোগ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে প্রশাসনিক কার্যকলাপ, কারুশিল্প এবং বাণিজ্য ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।

পাথরের হাতিয়ারের পাশাপাশি প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জীবাশ্মগত নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে, যা এই এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাণীজগতের ইতিহাস অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Bubalus palaeoindicus* (বন্য মহিষ), *Bos namadicus* (প্রাচীন ষাঁড়), *Bos* প্রজাতি, *Palaeoloxodon namadicus* (প্রাগৈতিহাসিক হাতি), *Equus namadicus* (ঘোড়া), পাশাপাশি সিংহ ও হায়েনার মতো বৃহৎ মাংসাশী প্রাণীর অবশেষ। এই প্রাণীসমূহের অধিকাংশ জীবাশ্ম উচ্চ প্লাইস্টোসিন যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত হয়েছে। তবে *Bos namadicus*-এর উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পর্যায়ের ইঙ্গিত বহন করে, যা এই অঞ্চলের প্রাণীজগতের দীর্ঘকালব্যাপী ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে (চট্টোপাধ্যায়, ২০১০)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বাবলাডাঙ্গা স্থান থেকে উদ্ধারকৃত একটি জীবাশ্মযুক্ত চোয়াল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্যামাদাস চ্যাটার্জি এই জীবাশ্মটির সময় নির্ধারণে রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। পরীক্ষার ফলাফলে জীবাশ্মটির কাল নির্ধারিত হয়েছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০,০০০ অব্দে, যা শুশুনিয়া অঞ্চলে মানব ও প্রাণীজগতের প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে আরও সুপ্রাচীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে (দাশগুপ্ত, ১৯৬৭)।

সামগ্রিকভাবে শুশুনিয়া অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত জীবাশ্মসমূহ প্লাইস্টোসিন যুগের অন্তর্গত এবং এগুলির মধ্যে বৃহৎ তৃণভোজী ও মাংসাশী প্রাণীর আধিক্য লক্ষ করা যায়। এই প্রমাণসমূহ একদিকে যেমন প্রাচীন পরিবেশ ও জলবায়ুর চরিত্র নির্দেশ করে, তেমনি বৃহৎ প্রাণীদের অভিবাসন ও বিস্তারের পথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত প্রদান করে (দত্ত, ১৯৭৬)। ফলত, শুশুনিয়ার জীবাশ্মগত নিদর্শনগুলি এই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ, প্রাণীজগত এবং মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। শুশুনিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডার দীর্ঘকালব্যাপী সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা ও সামাজিক অভিযোজনের একটি স্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাযাবর হাতিয়ার নির্মাতাদের উপস্থিতি থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে ব্যবসা ও কারুশিল্পে নিযুক্ত স্থায়ী বসতি স্থাপনকারী সম্প্রদায়গুলির বিকাশ পর্যন্ত এই এলাকা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব-পরিবেশ সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক সুবিধা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়— এই সব উপাদান মিলেই শুশুনিয়াকে

প্রাগৈতিহাসিক থেকে প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।

শিলালিপিগত ঐতিহ্য:

শুশুনিয়া পাহাড়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তাৎপর্য হলো এর শিলালিপির প্রমাণ। এই উচ্চভূমি দুটি প্রধান শিলালিপির জন্য বিখ্যাত, যা প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়। শিলালিপিটি পাহাড়ের পেছনের দিকের খোলা পাথরের উত্তর দেয়ালে অবস্থিত। এই পাথরটি দেখতে একটি শিলাশ্রয়ের মতো। এই শিলালিপিটি প্রথম আবিষ্কার এবং প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ বসু। পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটি সঠিকভাবে সম্পাদনা করেন। শিলালিপিটি তিনটি লাইন নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে দুটি লাইন একটি বড় চাকার নকশার নিচে খোদাই করা আছে, যেখানে চাকার স্পোক এবং কেন্দ্র থেকে শিখা বের হচ্ছে। তৃতীয় লাইনটি চাকার ডানদিকে রয়েছে। শিলালিপির ভাষা সংস্কৃত এবং অক্ষরগুলো গুপ্ত ব্রাহ্মীর পূর্বাঞ্চলীয় রূপ। প্রত্নলিপিতাত্ত্বিক দিক থেকে এটি খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। শিলালিপিটি হলো:

প্রথম অংশ:
"পুষ্করণাধিপতে মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য/
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণ কৃতঃ"

চিত্র- শুশুনিয়া শিলালিপি

শিলালিপির অর্থ হলো: "পুষ্করণের অধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণের পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মণের এই কাজটি, চক্রস্বামী বা চাকার অধিপতির প্রধান সেবক দ্বারা উৎসর্গীকৃত।" মনে হয়, চন্দ্রবর্মণ এবং তার পিতা সিংহবর্মণের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল পুষ্করণে, এটির অবস্থান বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পখন্না গ্রাম। 'চক্রস্বামী', অর্থাৎ চাকার অধিপতি বলতে প্রতীকীভাবে ভগবান বিষ্ণুকে বোঝায়। কারণ চক্র হলো বিষ্ণুর একটি বিশেষ অস্ত্র। যে পাহাড়ের পাদদেশের দেয়ালে শিলালিপিটি খোদাই করা হয়েছে, সেখানে খনন করা গুহাটি বিষ্ণুর বাসস্থান বা মন্দির হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল (শাস্ত্রী, ১৯১৫)। এটি এই অঞ্চলে বিষ্ণু পূজার ইঙ্গিত দেয়, যা বাংলায় প্রাপ্ত বিষ্ণু পূজার সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ। শাসক চন্দ্রবর্মণ এবং তার পিতা সিংহবর্মণ দুজনেই ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত । তাই তারা সেই অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেছিলেন। শিলালিপির সংস্কৃত ভাষা এবং গুপ্ত ব্রাহ্মী অক্ষর তাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ দেয়।

এই শিলালিপিটি শাসক চন্দ্রবর্মণের পরিচয় নিয়ে একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রবর্মণের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক চন্দ্রবর্মণকে দিল্লির কুতুবমিনারের কাছে স্থিত মেহরৌলি শিলালিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রের সাথে একই বলে মনে করেছেন, আবার অন্যরা তাকে রাজস্থানের পুষ্করণা অঞ্চলের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্দাসোর শিলালিপিতে উল্লিখিত মালবের বর্মণ বংশের নরবর্মণের ভাইয়ের সাথে চন্দ্রবর্মণকে একই করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মালবরা কখনোই রাজস্থানের পূর্ব সীমার বাইরে তাদের রাজ্য বিস্তার করেনি (মজুমদার, ১৯৪৩)। বেশিরভাগ পণ্ডিতের মতে, মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের ব্রাহ্মী লিপির শৈলী খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগে খোদাই করা সম্ভব নয়, যেখানে প্রত্নলিপিবিদ্যা অনুসারে শুশুনিয়া শিলালিপিটি চতুর্থ শতাব্দীর বলে প্রমাণিত। তাই, শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মণ এবং মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের চন্দ্র একই ব্যক্তি হতে পারেন না। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং দীনেশচন্দ্র সরকারের মতো পণ্ডিতরা তাদের যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের চন্দ্র আর কেউ নন, তিনি হলেন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। অন্যদিকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালও মেহরৌলি লৌহস্তম্ভের শিলালিপির সময়ের সাথে মিলে যায়।

আরেকটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হলো, মহান বিজেতা সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের একটি বিশাল অংশকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লেখ আছে যে, সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তের বারো জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম আর্যাবর্ত অভিযানে সমুদ্রগুপ্ত অচ্যুত, নাগসেন এবং গণপতি নাগকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় আর্যাবর্ত যুদ্ধে তিনি রুদ্রদেব, মতিলা, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দিন এবং বলবর্মণকে পরাজিত করেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্মণ নামটি পুষ্করণার শাসক হিসেবে শুশুনিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত চন্দ্রবর্মণই ছিলেন। কিছুটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, চন্দ্রবর্মণের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল। শাসক চন্দ্রবর্মণ কেবল একজন ছোট স্থানীয় প্রধান ছিলেন না, বরং একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন যিনি তাঁর রাজ্যকে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন (মজুমদার, ১৯৪৩)। শুশুনিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'গড়' নামক স্থান, একটি পাথরের তৈরি কুণ্ড, একটি সিংহের পাথরের মূর্তি যার মুখ থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে এবং নরসিংহের একটি বড় পাথরের মূর্তি—এই সবকিছু শুশুনিয়া পাহাড়ে রাজা চন্দ্রবর্মণের শাসনের প্রমাণ বহন করে। নরসিংহের মূর্তিটি এই প্রমাণ দেয় যে, শুশুনিয়া এবং তার আশেপাশের এলাকা একসময় বৈষ্ণব ধর্মের অধীনে ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিলালিপি সংক্রান্ত তথ্য থেকে শুশুনিয়ার প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আদি ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে এর ভূমিকার কথা জানা যায়। এই স্থানটি এখনও মানুষ অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা তাদের অবস্থানগত চাহিদার ভিত্তিতে এই স্থানটি বেছে নিয়েছিল। সেই সময়ে তাদের একটি পাথুরে পাহাড়ি এলাকার মৌলিক প্রয়োজন ছিল, যা তাদের পাথরের সরঞ্জাম, আশ্রয় এবং জলের উৎস সরবরাহ করত। এই উচ্চভূমিটি প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতির প্রয়োজনীয় সমস্ত শর্তই পূরণ করেছিল। এক্ষেত্রে যদি অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক স্থানগুলির দিকে দেখা যায়, তবে সহজেই তাদের বসবাসের স্থান পছন্দের ধরণটি জানা যায়। এটি তাদের জ্ঞানীয় (cognitive) ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। প্রাপ্ত জীবাশ্মর অবশেষ স্থানটির ভূতাত্ত্বিক সময়কাল এবং তারিখের ইঙ্গিত দেয়। এটি সেই সময়ের অঞ্চলের জলবায়ুও নির্দেশ করে। কিছু জীবাশ্ম প্রাণীদের অভিবাসন ধরণ সম্পর্কে অবহিত করেছে (দত্ত, ১৯৭৬)। পখন্নায় (তৎকালীন পুষ্করণা) খননকার্য থেকে জানা যায় যে শুশুনিয়া একটি আঞ্চলিক ক্ষমতার অংশ ছিল। সম্ভবত এটি গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি সীমান্ত চৌকি ছিল। শিলালিপিটি মন্দির নির্মাণের উপরও জোর দিয়েছে

এবং এই সময়ে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি প্রচারে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা তুলে ধরেছে। এই শিলালিপিগুলি কেবল ঐতিহাসিক পাদটীকা নয়; বরং এগুলি প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক গতিশীলতার জানালা। যা স্থানীয় ও সাম্রাজ্যিক শক্তির গতিশীল ভূমিকা, প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের বিস্তার এবং রাজকীয় অনুদানের মাধ্যমে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে প্রকাশ করে।

শুশুনিয়ার ঐতিহ্য, এর সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ প্রচেষ্টা স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষকে হুমকির মুখে ফেলেছে। আবহাওয়ার প্রভাবে উন্মুক্ত শিলালিপিগুলির আরও ক্ষয় রোধ করার জন্য জরুরি সুরক্ষা প্রয়োজন। এছাড়াও, শুশুনিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটনের জন্য পদ্ধতিগত খনন এবং আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, উন্নত ভূ-ভৌত জরিপ স্থানটির ভূগর্ভস্থ কাঠামো সম্পর্কে আরও তথ্য প্রকাশ করতে পারে, এছাড়াও তুলনামূলক শিলালিপি অধ্যয়ন গুপ্ত যুগের অন্যান্য রাজ্যগুলির সাথে এর সংযোগ স্পষ্ট করতে পারে। শুশুনিয়াকে নথিভুক্ত ও সংরক্ষণের জন্য এএসআই (ASI) এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, তবে বৃহত্তর জনসচেতনতা এবং তহবিল অপরিহার্য। ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ভার্চুয়াল পুনর্গঠনও শুশুনিয়ার ঐতিহ্যকে বৃহত্তর দর্শকদের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে পারে, যা এর ঐতিহাসিক মূল্যের প্রতি উপলব্ধি জাগিয়ে তুলবে।

শুশুনিয়া পাহাড় প্রাচীন বাংলার স্তরবিন্যস্ত ইতিহাসের এক জীবন্ত প্রমাণ, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার, আদি ঐতিহাসিক বসতি এবং সুস্পষ্ট শিলালিপি একত্রিত হয়ে মানব প্রচেষ্টার কথা বলে। এর প্রত্নতত্ত্ব এবং শিলালিপি এমন একটি স্থানের কথা প্রকাশ করে, যা মানুষের হাতিয়ার তৈরির সূচনা থেকে সাম্রাজ্যের যুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক মিলনস্থল ছিল। শুশুনিয়াকে পুনরায় পরিদর্শন করা কেবল অতীতকে উন্মোচন করা নয়; এটি এমন একটি ঐতিহ্যের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা, যা তার নীরব পাথর এবং বিবর্ণ লিপিগুলোর মাধ্যমে আজও আমাদের সাথে কথা বলে।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র। ১৯৬৭। প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া। কলকাতা, ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি এন্ড মিউজিওলজি, পৃ. ২৬-৩৪।

২. সিংহ, মানিকলাল। ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি।। বিষ্ণুপুর, শ্রী রাধা মোহন সিংহ পৃ. ৪৫-৬৯।

৩. বসু, নগেন্দ্রনাথ। মহারাজা চন্দ্রবর্মন। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৮।

৪. Ball, V. 1867. Stone implements found in Bengal. in proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, p 143.

৫. Banerjee, A.K. 1968. West Bengal District Gazetters: Bankura. Government of West Bengal, Calcutta, pp 34-40.

৬. Bhandarkar, D.R. Chhabra. B.C. Gai. G.S. (Eds.). 1981. Corpus Inscriptionum Indicarum: Inscriptions of the Early Gupta Kings. Delhi, Archaeological Survey of India.

৭. Biswas, A. S. N. Rajguru. 2017. A Geo-archaeological Perspective. Pratna Samiksha, vol-8, Kolkata. Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India pp 2-5.

৮. Chattopadhyaya, B.D., G. Sengupta and S. Chakrabarty. 2005. An Annotated Archaeological Atlas of West Bengal. Kolkata: Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India and Delhi: Manohar.

৯. Chattopadhyay, R.K. 2010. Bankura: A Study of Its Archaeological Sources. Kolkata, Platinum Publishers, pp 36-39.

১০. Datta, A.K. 1982. The Palaeohistory of Man and His Culture. Delhi, Agam Kala Prakashan, pp 82-85.

১১. Dutta, A. K. 1976. Occurrence of Fossil Lion and Spotted Hyena from Pleistocene Deposits of Susunia. Bankura District, West Bengal, Journal of the Geological Survey of India, vol-17, No.3, pp 386-391.

১২. Krishnaswami, V. D. 1960, Indian Archaeology 1959-60- A Review. New Delhi, The Director General Archaeological Survey of India, pp 48-50.

১৩. Majumdar, R.C. 1943. History of Bengal. vol-1, Dacca, The University of Dacca, pp 20-22, 30, 48.

১৪. Pal, A.C., S. Chakraborty. S. Guha, P.C. Maity and N. Chakrabarty. 1996. Prehistory of the Susunia Hill Complex and Suvarnarekha Valley, Calcutta. Directorate of Archaeology & Museum.

১৫. Paul, P. L. 1939. The Early History of Bengal. Calcutta. The Indian Research Institute.

১৬. Sankhyan, A. R. et all; Re-looking at Prehistoric Susunia. West Bengal, researchgate.net, 10/08/2025.

১৭. Sarkar, R. Puskarana, Chandravarman and an Inscription at Susunia Hill, Ramtek, Shodhsamhita. Vol- 10, Issues II, https://kksushodhasamhita.org. 10/01/2026.

১৮. Sen, B. C. 1942. Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal. Calcutta, University of Calcutta, pp 200-207.

১৯. Sen, D. A.K. Ghosh and M. Chatterjee. 1963. Palaeolithic Industries of Bankura. West Bengal. Man in India, vol-43, pp 100-113.